চতুর্থবার্তা

ISSN : 2319 - 1325
ISSUE : XII & XIII
Vol : XVI

সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক গবেষণাধর্মী
বিশেষজ্ঞমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা

বাংলাদেশের সাহিত্য

সম্পাদক ঃ ড. সুধাংশুকুমার সরকার

সহ-সম্পাদক ঃ স্বপনকুমার আশ

চতুর্থবার্তা

(নবম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা একত্রে)

এপ্রিল, ২০২০ এবং মার্চ, ২০২১

বিশেষ সংখ্যা

বাংলাদেশের সাহিত্য

।। বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত (PEER REVIEWED)

গবেষণাধর্মী ষাণ্মাসিক পত্রিকা ।।

সম্পাদক : ড. সুধাংশুকুমার সরকার

সহ-সম্পাদক : স্বপনকুমার আশ

চতুর্থবার্তা

চতুর্থবার্তা

(সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী, বিশেষজ্ঞমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত যাণ্মাসিক পত্রিকা)

মার্চ, ২০২১

ISSN 2319-1325

সম্পাদক :

ড. সুধাংশুকুমার সরকার

প্রচ্ছদ :

নন্দলাল

মুদ্রণ :

শরৎ ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৭০০০৭৩

যোগাযোগ :

বনছায়া অ্যাপার্টমেন্ট, জি-৩, ১৬ মধুসূদন দাস লেন
পোঃ বি. গার্ডেন, হাওড়া - ৭১১১০৩
মোবাইল : ৬২৯১১১৯৮২৪৮
ই-মেল : sudhangshusarkar37@gmail.com

মূল্য : ৫০০ টাকা

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশে ভাষাচর্চার রূপরেখা : একটি সমীক্ষা
মীর রেজাউল করিম ৯
গীতিকবি কাঙাল হরিনাথের কবিকৃতির মূল্যায়ন
নীলাংশু অধিকারী ২৪
বিচ্ছিন্নতার দর্শনের আলোকে শামসুর রহমানের কয়েকটি কবিতা
শ্রুতিপর্ণা রায় ৩৪
কবি শামসুর রাহমানের আত্মকথায় বাংলাদেশ : নতুন দেশের স্বপ্ন
অলিভিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০
কবি শহীদ কাদরী : পাঠকের দর্পণে
শিউলি বসাক ৫১
পার্বত্য চট্টগ্রামের কবিতা : বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রবণতা
আ. ন. ম. ফজলুল হক ৬০
রঙ্গপুরের নাট্যচর্চার ইতিহাস (১৮৮৫-১৯৬৭) : ফিরে দেখা
জিতেশচন্দ্র রায় ৭৭
মুনীর চৌধুরীর নাটক : সময় সমাজ ও মানুষ
স্বপনকুমার আশ ৮২
মুনীর চৌধুরীর নাটক 'চিঠি' : মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব-সংঘাত
শামস্ আলদীন ১১৩
মান্নান হীরা : দ্রোহের প্রতীক : একজন লক্ষীন্দর
প্রণবকুমার ভট্টাচার্য ১২৫
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের 'লালসালু' : বাঙালি মুসলিম সমাজজীবনের
অন্তর্লীন সংকট ও সংকটমুক্তির প্রতীকী ব্যঞ্জনা
গৌতম দাস ১৩৭
আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' : গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার অনবদ্য আখ্যান
সুধাংশুকুমার সরকার ১৪৪
শওকত আলীর কথাসাহিত্য : প্রসঙ্গ দেশভাগ
তপন রায় ১৫১
দেশভাগের আলোকে শওকত আলীর উপন্যাস : একটি পর্যালোচনা
শামসুজ্জামান মিলকী ১৬৯
যন্ত্রণাময় দেশভাগের কাহিনি : 'আগুন পাখি'
গৌরাঙ্গ বিশ্বাস ১৮০
আগুনপাখি— মন্বন্তর : ধর্ম : তামাশা : দেশভাগ : দেশমাতৃকার যন্ত্রণা
অণুশিলা সাহু ১৮৫

সেলিনা হোসেনের 'নীলময়ূরের যৌবন' : নিম্নবর্গীয় জীবনযন্ত্রণার আখ্যান

মহাদেব মণ্ডল ১৯৭

শহীদুল জহিরের 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' : অবাস্তব-বাস্তবতার রাজনীতি

অনুপম হাসান ২০৫

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস 'জলপুত্র' : জেলে জীবনের বিশ্বস্ত ভুবন

দীপক সাহা ২১৭

হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' : এক স্বতন্ত্র নির্মাণ এবং সমাজভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন

গৌতম সরকার ২২৩

আনিসুল হকের 'অন্ধকারের একশ বছর' : আলো বনাম অন্ধকারের লড়াই

নবাব সিরাজ ২৩০

ছোটগল্পকার আবু ইসহাক : জীবন যাপনের আখ্যান

জয় দাস ২৪১

আবু হেনা মোস্তফা কামালের জীবন, সাহিত্যচর্চা ও শিল্পীমানস

কুমার দীপ ২৫৮

আত্মজা একটি করবীগাছ : দেশভাগ ও হৃদয়যন্ত্রণার নির্মম দলিল

নবনীতা বৈদ্য ২৭৬

মাহমুদুল হকের গল্পসংকলন 'প্রতিদিন একটি রুমাল' : প্রয়োজনীয় কিন্তু অপাংক্তেয়

মানিকলাল সাহা ২৮১

মৃত্যুই ধ্রুব জীবনের পরপারে : মৃত্যুর পরই কি আত্মা ধ্রুব হয়ে ওঠে?

সুরেশ মণ্ডল ২৯২

যুগলবন্দি : স্বপ্ন আর চেতনের সমাপতন

দেবব্রত চক্রবর্তী ২৯৮

খোয়াই নদীর বাঁক বদল : স্বপ্ন ও স্বপ্ন-ভঙ্গের আখ্যান

দুরন্ত মণ্ডল ৩১৫

হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্পে মুক্তিযুদ্ধ

সুরজিৎ মণ্ডল ৩২১

কায়েস আহমেদের গল্প : বিপন্ন সময়ের কথা

সুবোধ মণ্ডল ৩২৭

বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্প : লোকসাংস্কৃতিক অভিক্ষেপ

মোহাম্মদ মেহেদী উল্লাহ ৩৩৩

মুক্তিযুদ্ধের গল্প : একটি নিবিড় আলোচনা

বাসব দাস ৩৫২

ডা. লুৎফর রহমানের জীবন ও সাহিত্য

রবিউল মণ্ডল ৩৫৯

অ্যান্থনী মাসকারেনহাসের "THE RAPE OF BANGLADESH" : জন্মকালীন বাংলাদেশের যন্ত্রণা গাথা

কুন্তল সিনৃহা ৩৬৫

লেখক পরিচিতি ৩৭৫

অ্যান্থনী মাসকারেনহাসের "THE RAPE OF BANGLADESH" : জন্মকালীন বাংলাদেশের যন্ত্রণা গাথা

কুন্তল সিন্‌হা

অ্যান্থনী মাসকারেনহাসের গ্রন্থ 'The Rape of Bangladesh' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। জন্মসূত্রে ভারতীয় অ্যান্থনী মাসকারেনহাস একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন পূর্ববাংলার মানুষের ওপর যে শোষণ, বঞ্চনা ও বর্বর আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল, সেই প্রেক্ষাপটের ওপরেই সমগ্র গ্রন্থটি রচিত। করাচির সাংবাদিক অ্যান্থনী সাংবাদিকতার কাজে দীর্ঘদিন পূর্ববঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন। কিন্তু নিছক পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেননি। নির্মম সত্য প্রকাশ করে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করার একটা মহত্তর মানবিক বোধ তাঁর মধ্যে সবসময় কাজ করেছিল। বইটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "What I saw in East Bengal was to me more outrageous than anything I had read about the in human acts of Hitler and Nazis. This was happening to my own people. I knew I had to tell the world about the agony of East Bengal or forever carry within myself the agonizing guilt of acquiescence." [১]

১৯৭১ সালের ১৪ই জুন লণ্ডনের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সানডে টাইমসে' পূর্ববঙ্গে পাক-সেনার বর্বরোচিত গণহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বইটি সেই বিবরণেরই যুক্তিপূর্ণ উপসিদ্ধান্ত। অ্যান্থনী তাঁর বইতে পাকিস্তানি নৃশংসতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেননি, এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের স্বার্থের কথাও বলেননি, তিনি পূর্ববঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনা সমূহের পিছনে যে প্রেক্ষাপট রয়েছে তা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং মানবজাতির ঘোরতর দুঃসময়ে তাদের প্রজন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোর উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে "What I have tried to do is to sketch the political background to the horrifying events and to explain the motivations of the main characters in what perhaps is the greatest human tragedy known to our generation." [২]

অ্যান্থনী তাঁর গ্রন্থটিতে কতগুলো অধ্যায় বিভাজন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের নাম "Prologue to disaster' এখানে তিনি পূর্ববঙ্গে দুর্যোগের ঘনঘটা সূচনার প্রাকমুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে বাঙালি মুসলিমদের কিছু মৌলিক পার্থক্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে লড়াই করলেও স্বাধীন ভারতে হিন্দু আধিপত্যের আশঙ্কায় ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গের মাঝে প্রায় এক হাজার কিমি এলাকা জুড়ে ভারতীয় ভু-খণ্ড থাকলেও ধর্মীয় একাত্মতার ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ভৌগোলিক দূরত্ব বাদ দিয়ে সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবন-যাপন, স্বভাব, রুচি এবং সর্বোপরি, অর্থনীতির প্রশ্নে দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এতবেশি পার্থক্য ছিল যে অচিরেই ধর্মগত একাত্মতার আবেগ হারিয়ে যেতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য প্রতিকূল পরিবেশে স্বভাবতই সেখানকার মানুষেরা উগ্র, রুক্ষ, পরিশ্রমী হয়। কিন্তু ব-দ্বীপ অঞ্চলের সমতলের বাঙালিরা ছিল বিপরীত স্বভাবের। কোমলতা, মিষ্টতা, আবেগ, সরলতা, সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন এগুলো ছিল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বাঙালির সহজাত গুণ। এমনকি খেলাধূলার ব্যাপারেও দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি খেলা হতো হকি এবং ক্রিকেট, অন্যদিকে বাঙালির প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। এমনকি বাঙালিদের তুলনায় পাকিস্তানিরা অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সাথে বেশি একাত্মতা অনুভব করতো।

যদিও ইসলাম ছিল উভয় অঞ্চলের মানুষের যোগসূত্রের প্রধান শর্ত। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির চব্বিশ বছরের ইতিহাসে দেখা গেল উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় একাত্মতা সেভাবে গড়ে ওঠেনি, বরং সেই বন্ধন ধীরে ধীরে ছিন্ন হচ্ছিল। অবিভক্ত ভারতে এই উভয় অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পেতে মরিয়া ছিল এবং ধর্মগত কারণে ভারতীয়দের সাথে একটা তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু লেখকের মতে, "Denied this cohesive factor, the new Muslim entitles began to seek separate channels of self-interest after the first flush of creation had faded. For very real reasons of survival and advancement, the more aggressive West Pakistan began to dominate the naturally prosperous and more populous east. For its own survival, East Bengal began to resist this domination. Religion took a back seat before the economic issues. The conflict began to escalate."[৩] নতুন স্বাধীন পাকিস্তানের জনমানসের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার আবেগ স্তিমিত হয়ে এসে পূর্ববঙ্গের মানুষের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের একটা চেষ্টা দেখা দেয়। এর সঙ্গে

পশ্চিম পাকিস্তানের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং অগ্রগতির একটা বাস্তব তাগিদ ছিল। ফলে এখান থেকে উভয় অঞ্চলে মূল দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদ সহজেই ধর্মগত একাত্মতার আবেগকে স্তিমিত করে দেয়।

যখনই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুতর সমস্যার প্রশ্ন এসেছে, তখনই পাকিস্তানি শাসকেরা ধর্মীয় অন্ধতার মধ্যে পূর্ববঙ্গের মানুষদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। যা ছিল দু'দশক আগের সাম্প্রদায়িক সমস্যা, আধুনিক স্বাধীন পাকিস্তানে বারবার সেই ধর্মীয় গোঁড়ামির ঢাক পেটানো হয়েছে। সাম্প্রদায়িক শত্রুতাকে পাকিস্তানের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেহেতু হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইসলামকে নবতর রূপদানের জন্য পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কাশ্মীর সমস্যা। পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা সুলভ বাহন হিসেবে যুক্ত হয়েছিল। পাকিস্তানের নেতারা বলতেন, "foreign policy emerges from the ceasefire line in Kashmir."[৪] পাঞ্জাবি ও পাঠানরা এই ঘোষণা শুনে অত্যন্ত খুশি হতো, কেননা তাদের পরিজন ও আত্মীয়েরা কাশ্মীরে ছিল। কিন্তু বাঙালিদের কাশ্মীর নিয়ে ততটা আবেগ উচ্ছ্বাস ছিল না। যদিও দেশপ্রেমের কারণে তারা অনেক সময় কাশ্মীর নীতিকে সমর্থন করতো। পরবর্তীতে শুধু উত্তেজনা সৃষ্টির কারণেই পাকিস্তান সরকার কাশ্মীর আবেগকে উস্কে দিত। একবার প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন. এস. কেনেডি পাকিস্তানি কূটনীতিকদের বলেছিলেন "Mr. Ambassador, I think your country is more concerned with the Kashmir dispute than it is with Kashmir."।[৫]

বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন যে, অর্থনৈতিক আধিপত্য ও শোষণের নির্যাতন এতবেশি ছিল যে, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের আদর্শ পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের আর ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। শেখ মুজিবর রহমানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, "Bengal's political partnership within West Pakistan was on an ideological basis — in protest and self-defiance against the exploitation by the religious majority of British India. No one ever thought that this would turn into an economic exploitation by a more developed West Pakistan. Her (East Bengal) struggle is an attempt at survival and a protest against exploitation."।[৬]

পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকলে পাকিস্তানের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ নবাব মুস্তাক আহমেদ দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন- "You can see the wings, but not the bird"।[৭] এখন এমনকি পাখিটির ডানার ঝাপটানিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সংঘর্ষের মূল কারণগুলির কথা বলতে গিয়ে লেখক কয়েকটি কারণের

কথা বলেছেন। যেমন, i) No Partnership, ii) The Language, iii) Islam, iv) Economic factor.

প্রথম কারণটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংবাদিক দেখিয়েছেন, পাকিস্তানের উচ্চ প্রশাসনে ৩৬ ভাগের বেশি বাঙালি মুসলিমকে রাখা হয়নি। ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহা খানের দপ্তরে ১৯ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ৩ জন বাঙালি ছিলেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতেও বাঙালির সংখ্যা ছিল নগণ্য। ১৯৭০ সালে মাত্র একজন বাঙালি লেফটেন্ট জেনারেল ছিলেন। আকাশ ও জলবাহিনীতে কোনো বাঙালি ছিল না। বাঙালিরা পাকিস্তানের সমমর্যাদার পদ পেত না।

পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে মোট আট বছর লেগেছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাঙালিদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছিল। যুক্তি দেখানো হয়েছিল যেহেতু পূর্ববঙ্গের দেড় কোটি হিন্দুর অস্তিত্ব ছিল, তাই পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালিরা পাকিস্তানিদের উগ্র ভাষাগত আধিপত্যবাদের শিকার হয়েছিল। যদিও পাকিস্তানে মাত্র দশ শতাংশ মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলত। বাংলা সহ অন্যান্য ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ একতরফা ভাবে ঘোষণা করেছিলেন, "Urdu and Urdu alone" would be the state language of Pakistan."[৮] জিন্নাহর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আধিপত্যবাদী ঘোষণা বাঙালিদের ধিকিধিকি করে জ্বলা ক্রোধের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি দেয়। পূর্ববঙ্গে প্রতিবাদী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। বহু ছাত্র ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমানও গ্রেফতার হোন। তারপর ধীরে ধীরে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশী অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমনকি আইনসভাতেও বাংলায় কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়। প্রতিবাদ উঠলে তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান বলেন, "Pakistan is a Muslim state and it must have as its lingua Franca the language of the Muslim nation ... it is necessary for a nation to have one language, and that language can only be urdu."[৯]

ভাষা আন্দোলন চরমে পৌঁছালে বহু মানুষের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকেও উর্দুর সঙ্গে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। উর্দু ছিল 'মুসলিমদের জাতীয় ভাষা'। লিয়াকত খানের এই বক্তব্য শুধু বাঙালি মুসলিম আদর্শ বিরোধী নয়, সমগ্র ইসলাম ধর্মের আদর্শ বিরোধী কথা ছিল। কেননা কোরাণের ভাষা ছিল আরবী। আসলে বাঙালি মুসলিমদের বাংলা ভাষাকে কটাক্ষ করেই একথা বলা হয়েছিল। পাকিস্তানের পশ্চিম প্রদেশের বালুচি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি অথবা পশতুর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু "It was directed solely at Bengali. There no apparent rational for his argument, only blind prejudice."[১০]

তৃতীয়ত, শুধু তাই নয়, বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষের আরেকটা কারণ হিসেবে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা বলা হত। যেহেতু পূর্ববঙ্গ প্রচুর হিন্দুদেরও আবাসভূমি ছিল। আসলে এ ধরনের মনোভাব ছিল অযৌক্তিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসূত। কেননা, বহু হিন্দু পাঞ্জাবি ভাষাতেও কথা বলত। এইভাবে বাঙালি মুসলিমদের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবজ্ঞা করুণা ক্রমশ বেড়েই চলছিল। লেখক এর কিছু দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন— "Denigration of the piety of Bengali Muslims has also been manifest in similarly curious ways. Manik Feroze Khan Noon, the Punjabi Governor of East Bengal in 1952, was reported to have once remarked that the Bengalis were "half Muslims" and accused them of not bothering to halal (kosher) their chickens. This insult provoked a counterblast from the venerable Maulana Bhashani. "Have we to lift our lungis (loins – cloths) to prove we are Muslims ?"[১১]

চতুর্থত, অ্যান্থনী মাসকারেনহাস পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন তথ্যাদি তুলে ধরে বলেছেন, "The big issue-economic disparity— in the East-West Pakistan relationship is crowded with them"।[১২] বহু অর্থনীতিবিদদের যুক্তি ও তথ্য তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ছাড়া কিছুই ছিল না— ১) ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় পূর্ববঙ্গের মানুষদের তুলনায় ৬১ শতাংশ বেশি ছিল। যা দশ বছর আগে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা পিছু আয়ের দ্বিগুণ ছিল। ২) ১৯৫০-৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য উন্নয়ন খাতে ২০ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছিল, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৮০শতাংশ বরাদ্দ ছিল। ১৯৬৫ -৭০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মাত্র ৩৫ শতাংশ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল, অন্যদিকে, পঁচাশি শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল। যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার চুয়ান্ন শতাংশ ছিল বাঙালি। ৩) সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি কৃত দ্রব্যের ৪০-৫০ শতাংশ পূর্ববঙ্গের দখলাকৃত বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গকে উচ্চ মূল্যে বাজে দ্রব্য বিক্রির 'dumping ground" হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ৪) বহির্বিশ্বে পূর্ববঙ্গে রপ্তানি কৃত উদ্বৃত্ত আয় পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের পরিমাণ ছিল "The total transfer of resources in this manner in the 20 years ending 1968-69 has been computed at Rs 31 million, or 2,100 million dollars of the open market exchange rate"।[১৩] ৫) এইভাবে ক্রমাগত অর্থনৈতিক শোষণ লুণ্ঠন ও বঞ্চনার দ্বারা পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক অঞ্চলে পরিণত হয়।

লেখক তাঁর আলোচ্য গ্রন্থের 'গণহত্যা' (Genocide)" শিরোনামের অধ্যায়ে ১৯৭১ সালে পাকসেনা বাহিনী গণহত্যার জন্য যেসব মানুষদের চিহ্নিত করেছিল তাদের তালিকা তুলে ধরেছেন–

1) The Bengali militarymen of the East Bengal Regiment, the East Pakistan Rifles, police and para military Ansars and Mujahids.

2) The Hindus

সাংবাদিক লেখক কুমিল্লায় সেনা অফিসারদের বলতে শুনেছিলেন, "আমরা সৈনিক, আমরা ভীতু নই। তাই আমরা শুধু হিন্দু পুরুষদের হত্যা করছি, মহিলা এবং শিশুদের ছেড়ে দিচ্ছি'...।"

3) The Awami leagues - all office bearers and volunteers down to the lowest link in the chain of command.

4) The students — College and university boys and some of the more militant girls.

5) Bengali intellectuals such as professors and teachers whenever damned by the army as 'militant'.[১৪]

১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ ধানমণ্ডির একটি গলিতে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ির সামনে একটি রিক্সা দ্রুতগতিতে থেমে একটি চিরকুট বঙ্গবন্ধুর জন্য নিয়ে এসেছিল। চিরকুটে একটি ভয়ঙ্কর সংবাদ লেখা ছিল– "Your house is going to be raided tonight"[১৫] এই সাবধান বাণীর পরেও মুজিবর সেই রাত্রে তাঁর নিজের বাসায় থেকে গিয়েছিলেন। রাত প্রায় দেড়টার সময় আকাশ বাতাস যখন বন্দুকের গুলির শব্দে ও ধোঁয়ায় ভরে গেল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সেনারা প্রবেশ করলেন, তাকে গ্রেপ্তার করে সেনারা নিয়ে গেল। মুজিবের স্ত্রী তাঁর সন্তান সহ তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। তারপর সেনা ভর্তি আরেকটি ট্রাক ফাঁকা বাড়িতে সমস্ত কিছু তছনছ করে দিল। সেনারা চলে যাবার পর বাড়িটি একটি পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়। পূর্ববাংলায় এরকম অজস্র গ্রাম ছিল, যেখানে পাক সেনার সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে গ্রামের সারি সারি বাড়ি ফাঁকা রেখে সমস্ত মানুষ পালিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ছাড়ার আগে যুদ্ধ দেবতাদের খুশি করার জন্য সবুজ ও সাদা রঙের পতাকা টানিয়ে দিয়েছিল। যারা সৌভাগ্যবান তারা সীমা পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল নিজেদের দুর্ভাগ্যকে সঙ্গী করে। অন্যরা শেখ মুজিবের মতো ধরা পড়ে এবং "...had vanished from public view. And then there were those bloated bodies disfigured by baynot holes and gunshot wounds, were to be found lying in the fields, in ditches and in between coconut palms gently swaying in the breeze."[১৬]

সেদিন রাতে পাক সেনা গণহত্যা চালানোর আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট রাতে করাচি পৌঁছানোর পরই পাক সেনা পূর্ববঙ্গে নারকীয় বর্বর গণহত্যা চালিয়েছিল। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা থেকে পাকিস্তান সেনা সন্ত্রাস শুরু করেছিল। তারা প্রথমে পূর্ববঙ্গে রাইফেল বাহিনীকে টেঙ্ক, বাজুকা এবং স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে আক্রমণ হেনেছিল। একইভাবে রাজারবাগ পুলিশের হেড কোয়ার্টারও আক্রমণ করা হয়েছিল। উভয় জায়গায় প্রায় ৫০০০ জন অপ্রস্তুত বাঙালি প্রতিরোধ চালিয়েছিল। কিন্তু পাকসেনা সংখ্যায় অধিক থাকায় এবং আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ থাকায় লড়াইয়ে জিতে গিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর আগে বাঙালিরা তাদের জাহান্নমে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

শহরের অন্যত্রও পাক সেনারা একই অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ হানে। আওয়ামি লীগপন্থী পত্রিকা 'দি পিপ্‌ল' এর অফিসের কর্মচারিরা পালাতে চেষ্টা করলে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এবং পত্রিকার অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া, 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'সংবাদ' পত্রিকার সাংবাদিক সহ সমস্ত অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র ও শিক্ষককে হত্যা করা হয়। শাঁখারি বাজার, তাঁতিবাজার অথবা বিরাট রেসকোর্স ময়দানের মন্দিরের পাশে শত শত হিন্দু বাড়িতে ঢুকে হত্যা চালানো হয়। সেদিন প্রায় আট হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা হয়। নিউমার্কেটের লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাঁর বাড়িতে স্ত্রীর সামনে হত্যা করা হয়। অন্যান্য আওয়ামী লিগ নেতা ও ছাত্র নেতাদেরও একই অবস্থা হয়।

মুসলিম ছাত্রাবাস 'ইকবাল হল' এবং নিকটবর্তী হিন্দু ছাত্রাবাস 'জগন্নাথ হল' ঘেরাও করে বাজুকা এবং স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে গুলি করে সমস্ত ছাত্রদের অবরুদ্ধ অবস্থায় হত্যা করা হয়। তারপর তাদের দেহ মাটি চাপা দেওয়া হয় এবং ছাদের উপরে পচনের জন্যও অনেক মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়।

দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া বাঙালিরা জানিয়েছেন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শত শত ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপকদের 'জিজ্ঞাসাবাদ' এর নামে হত্যা করা হয় এবং এইভাবে "...the flower of Bengali youth been scoured away by the dreadful 'cleansing process' undertaken by the country"[১৭]

এইভাবে প্রায় ৪৮ ঘন্টা ধরে ঢাকায় রক্তস্নান চলেছিল। যদিও 'সান্ধ্য আইন" এর ঘোষণা প্রশাসন থেকে করা হয়নি। তবু মিথ্যা সান্ধ্য আইন ভাঙ্গার অপরাধে ২৬ মার্চের আগে দিনের আলোয় কয়েকশো নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

ভুট্টোসাহেব নৃশংস এলাকা পরিদর্শন করে করাচির উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং সেখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, "Pakistan is saved"[১৮] যা

লেখকের মতে ছিল শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উক্তি। ধীরে ধীরে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সকলের চোখে পড়ল। আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত অবশিষ্ট বাঙালিরা জানতে পারল যে পাকসেনা পূর্ববঙ্গে ভয়ঙ্কর নরহত্যা চালিয়েছে।

পাকিস্তান সেনারা যখন ঢাকা বা অন্যান্য অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড চালাত তখন কাকে হত্যা করা হবে তাঁর তালিকা সঙ্গে করে আনত। বিশেষ করে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের উপর সেনারা প্রতিশোধ নিত। বিশেষ করে হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করা হত। কেননা তাদের পাকসেনারা 'Indian agents' মনে করত। তারাই মুসলিম বাঙালিদের বিদ্রোহী করে তুলেছে, তারাই একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল যারা প্রতিরোধ দিতে সক্ষম ছিল বলে পাক সেনারা মনে করত। অন্যদেরও গণহত্যার শিকার করা হয়েছিল, কেননা- "....it was thought that their political ambitions were a direct threat to the integrity of the state"[১৯] লেখক সাংবাদিকের মতে গণহত্যা ছিল, "The genocide, I was to find out, was the 'cleasing process' the military regime intended as a solution of the political problem. Hand and Hand with it would goon equally brutal colonization of the process."[২০]

কুমিল্লার ১৬ নং ডিভিশনের কার্যালয় থেকে বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তারা বদ্ধ পরিকর। এর জন্য যদি ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে হয় এবং ত্রিশ বছর ধরে যদি প্রদেশটিকে উপনিবেশ বানিয়ে রাখতে হয় তাও সঠিক। এটাই ছিল সামরিক শাসকদের চূড়ান্ত সমাধান। জার্মানির হিটলারের মত বর্বর গণহত্যার দ্বারা পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গের ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল।

লেখক সাংবাদিক অ্যান্থনী কুমিল্লায় পাক সেনার সঙ্গে থাকার সময় হত্যা ও অগ্নিসংযোগের ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গ্রামবাসীরা সেনাদের আটকাতে একটি সেতু ভেঙে দিলে সেনারা প্রতিশোধ নিতে সমস্ত গ্রামকে ধ্বংস করে ফেলত। গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়ে সামরিক বাহিনী অপরাধী হিন্দুদের হত্যা করত।

সাংবাদিক দিনের পর দিন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছেন কীভাবে স্থানীয় সামরিক আইন প্রশাসনের একটি কলমের খোঁচায় মানুষের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে দিত এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে আরেক জনকে চিহ্নিত করা হত। লেখক দেখেছেন সামরিক বাহিনীর মেসে যারা ছিল তথাকথিত সম্মানীয় ব্যক্তি, সারাদিন হত্যাকার্য সম্পন্ন করে রাতের বেলায় কে কত বেশি হত্যা করেছে এই নিয়ে নগ্ন রসিকতা ও প্রতিযোগিতার গল্প শোনাতেন। এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য অ্যান্থনি ১৯৭১ সালের ১৩ জুন 'সানডে টাইমস'কে পাঠিয়ে ছিলেন । তিনি প্রশ্ন রেখেছেন- "The world knows why 8,000,000 Bengali men,

women and children have fled across the borders to India? Why countless others now face the grim prospect of death by famine and disease?"[২১]

শুধুমাত্র ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের গণহত্যাই নয়, সেইসঙ্গে গণহত্যার পূর্বেও কীভাবে বাংলার হাজার হাজার অসহায় নারী, পুরুষ, শিশুর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়েছে লেখক তাঁর সাংবাদিক জীবনে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্রোধ ও হতাশা থেকে জনগণের হত্যা যজ্ঞে সামিল হওয়ার চেয়ে একটি সভ্য সরকারের ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যার কর্মসূচী অনেক ভয়ঙ্কর বলে তিনি মনে করেন।

সমস্ত হত্যার পোস্টমর্টেম করা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তিনি এমন কিছু প্রয়োজনীয় ঘটনা তুলে ধরতে চেয়েছেন যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কুমিল্লায় সার্কিট হাউসে অতিথি নিবাসে থাকার সময় তিনি চোরের অপবাদ দিয়ে একজন খ্রিস্টান ও দু'জন হিন্দুকে পাক সেনার লাঠির আঘাতে হত্যা করতে দেখেছিলেন।

সাংবাদিক মনে করেন পূর্ব বাংলায় পাক সেনার এই গণহত্যার অপরাধ কোনভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয়। যাকে পাক সরকারের প্রবক্তারা বলেছিল 'justifiable retaliatory action'. বিদ্রোহী বাঙালিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের স্বার্থে। অবাঙালি হত্যার কথা বলে এই গণহত্যাকে ন্যায়সঙ্গত বলে যারা দাবি করছে তাও কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ঘটনাগুলো চারটে বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমত, অবাঙালি হত্যার আগেই সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাঙালি অফিসারদের বিদ্রোহ ২৬ মার্চ রাতে পরিকল্পনা করা হয়নি, তাই একরাত আগে 'preemptive strike' এর কোন যুক্তি ছিল না। তৃতীয়ত, নাৎসিদের মতো বর্বর উপায়ে সমস্যা সমাধানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছিল, যা ছিল একান্তভাবেই পাকিস্তান সরকার এবং সামরিক শাসকদের নিজস্ব সৃষ্টি। চতুর্থত, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তিসাধন ছিল পাক সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পূর্ববঙ্গে হাড় হিম করা এই নৃশংস ঘটনাগুলো তুলে ধরে সাংবাদিক লেখক অ্যান্থনি সবশেষে বলেছেন, "This is the reality of the rape of Bangla Desh Not all the propaganda in the world can hide it"[২২]

তথ্যসূত্র

১) The Rape of Bangla Desh, Anthony Mascaranhas, Vikash Publications, Delhi, প্রকাশকাল ১৯৭১ সালের ১১ই অক্টোবর, পৃষ্ঠা -Preface-v
২) ঐ পৃষ্ঠা - Preface-vi
৩) ঐ পৃষ্ঠা - ১১

৪) ঐ পৃষ্ঠা - ১২
৫) ঐ পৃষ্ঠা - ১২
৬) ঐ পৃষ্ঠা – ১২
৭) ঐ পৃষ্ঠা - ১২
৮) ঐ পৃষ্ঠা - ১৬
৯) ঐ পৃষ্ঠা - ১৭
১০) ঐ পৃষ্ঠা – ১৭
১১) ঐ পৃষ্ঠা - ১৮
১২) ঐ পৃষ্ঠা - ২০
১৩) ঐ পৃষ্ঠা - ২০
১৪) ঐ পৃষ্ঠা – ১১৬-১১৭
১৫) ঐ পৃষ্ঠা - ১১১
১৬) ঐ পৃষ্ঠা - ১১৩
১৭) ঐ পৃষ্ঠা - ১১৫
১৮) ঐ পৃষ্ঠা - ১১৬
১৯) ঐ পৃষ্ঠা - ১১৭
২০) ঐ পৃষ্ঠা - ১১৭
২১) ঐ পৃষ্ঠা – ১১৮
২২) ঐ পৃষ্ঠা – ১২০